জলবায়ু পরিবর্তন ও অতি বৃষ্টিজনিত বন্যা

মো. খালিদ হাসান

বাংলাদেশ একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশ যেখানে বন্যা একটি বার্ষিক বাস্তবতা। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কখনো অতি বৃষ্টি আবার কখানো খরা প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে একদিকে যেমন হঠাৎ করে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে তেমনি মরুকরণের ঝুঁকিও বেড়েছে। অতি বৃষ্টি বলতে এমন একধরনের অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতকে বোঝায় যা স্বাভাবিক গড় মাত্রার তুলনায় অনেক বেশি এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে ঘটে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের মতে, কোনো স্থানে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৮৯ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত হলে তাকে 'Heavy Rainfall' বা অতি বৃষ্টি হিসেবে গণ্য করা হয়। অতি বৃষ্টি নদীর পানি প্রবাহকে অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়ে তোলে এবং নিম্নাঞ্চলে পানি জমে গিয়ে জনজীবন বিপর্যস্ত করে তোলে।

২০২৪ সালের আগস্ট মাসে বাংলাদেশে অতি বৃষ্টির ফলে সৃষ্ট বন্যা দেশের পূর্বাঞ্চলে ভয়াবহ মানবিক ও অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করে। এই বন্যায় ১১টি জেলা—যেমন কুমিল্লা, ফেনী, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, খাগড়াছড়ি ও কক্সবাজার—প্রভাবিত হয়, যেখানে প্রায় ৫৮ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং প্রায় পাঁচ লাখ জনেরও বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে ৩ হাজার ৪০০টিরও বেশি আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেন । বন্যার ফলে ৭১ জনের মৃত্যু হয়, এবং প্রায় ৩ দশমিক ২৬ লাখ হেক্টর কৃষিজমি ও মাছের খামার ক্ষতিগ্রস্ত হয় ।

এই দুর্যোগের ফলে ৪৬২ কিলোমিটার সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যার মধ্যে জাতীয় মহাসড়ক, আঞ্চলিক মহাসড়ক ও জেলা সড়ক অন্তর্ভুক্ত । প্রায় ২৬ হাজার ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় এবং প্রায় তিন লাখ ঘরবাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় । বন্যার ফলে ৭ হাজারের বেশি স্কুল বন্ধ হয়ে যায়, যার ফলে প্রায় ১ দশমিক ৭ মিলিয়ন শিক্ষার্থী শিক্ষা কার্যক্রম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়।

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা—এই তিনটি প্রধান নদীসহ প্রায় ৭০০টি নদী শাখা-উপশাখা নিয়ে দেশের বিস্তৃত জলপথ তৈরি করেছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকা নিচু ও সমতল ভূমির অন্তর্গত। দক্ষিণাঞ্চলের বিস্তীর্ণ চরাঞ্চল ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর-বাওড় এলাকা বর্ষায় সহজেই পানিতে নিমজ্জিত হয়। এর পাশাপাশি দেশের জলবায়ু মৌসুমি প্রকৃতির—বর্ষাকালে জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রবল বৃষ্টিপাত ঘটে। এই সময় ভারি বৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পানির মিলনে নদ-নদীর পানি বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। এসব ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের বন্যাপ্রবণতাকে বহুগুণে বাড়িয়ে তোলে।

অতি বৃষ্টির ফলে সৃষ্ট বন্যাগুলোর মধ্যে আকস্মিক বন্যা বা Flash Flood অন্যতম। এটি সাধারণত পাহাড়ি অঞ্চলে ঘটে থাকে, বিশেষ করে সিলেট, সুনামগঞ্জ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে। হঠাৎ অতিবর্ষণের ফলে পাহাড় থেকে নেমে আসা প্রবল পানির তোড়ে নিম্নাঞ্চল দ্রুত প্লাবিত হয়। সময়মতো সতর্কতা দেওয়া কঠিন হওয়ায় মানুষজন প্রস্তুতি নিতে পারে না, ফলে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি অনেক বেশি হয়। অন্যদিকে, পাহাড়ি ঢল ও ভূমিধস অতি বৃষ্টির আরেকটি ভয়াবহ পরিণতি। টানা ভারি বৃষ্টির ফলে পাহাড়ের মাটি নরম হয়ে যায় এবং ভূমির সংরক্ষণক্ষমতা দুর্বল হয়ে ধসে পড়ে। এর ফলে পাহাড়ি বসতিগুলো চাপা পড়ে অনেক সময় প্রাণহানি ঘটে। বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়িতে এই ধরনের দুর্যোগ প্রায় প্রতি বর্ষায় দেখা যায়। নদীগুলোর জলধারাও দ্রুত বেড়ে যায়, ফলে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়।

শহরাঞ্চলে অতি বৃষ্টির পর দ্রুত দেখা দেয় নগর বন্যা ও জলাবদ্ধতা। ঢাকার মতো ঘনবসতিপূর্ণ নগরীতে অপরিকল্পিত নগরায়ণ, জলাধার ভরাট এবং দুর্বল ড্রেনেজ ব্যবস্থার কারণে সামান্য অতিবৃষ্টি হলেই রাস্তাঘাটে পানি জমে যায়। অনেক সময় এই জলাবদ্ধতা কয়েকদিন স্থায়ী হয়, যা জনজীবন, পরিবহণ ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বিরূপ প্রভাব ফেলে। নদীর পানি প্রবাহিত হয়ে বাঁধ ভেঙে গেলে বা অতিরিক্ত পলি জমার কারণে নদী প্লাবনও ঘটে, যা বিস্তৃত অঞ্চলজুড়ে দীর্ঘমেয়াদি বন্যার সৃষ্টি করে।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের কারণে বিভিন্ন অঞ্চল ভিন্ন ভিন্ন ধরনের বন্যা ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় জেলা যেমন সিলেট, সুনামগঞ্জ ও মৌলভীবাজার প্রতি বর্ষায় হাওর অঞ্চলে অতি বৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে ভয়াবহ আকস্মিক বন্যায় আক্রান্ত হয়। বিশেষ করে সুনামগঞ্জের তাহিরপুর ও দোয়ারাবাজার এবং সিলেটের জৈন্তাপুর ও গোয়াইনঘাট এলাকায় প্রতিবছর কৃষি, অবকাঠামো ও বসতবাড়ির মারাত্মক ক্ষতি হয়। একইভাবে, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য জেলা চট্টগ্রাম, বান্দরবান ও রাঙ্গামাটিতে টানা ভারী বর্ষণের ফলে ভূমিধস ও পাহাড়ি ঢলের ঘটনা ঘনঘন ঘটে, যা জনজীবন ও পরিবেশ উভয়কে বিপন্ন করে তোলে। উত্তরাঞ্চলের কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা ও জামালপুর জেলার বিস্তীর্ণ চরাঞ্চল প্রতিবছর বর্ষায় তীব্র নদী প্লাবনে আক্রান্ত হয়। ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও যমুনা নদীর পানি অতি বৃষ্টির কারণে হঠাৎ বেড়ে গিয়ে হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে। অন্যদিকে, মধ্যাঞ্চলের ঘনবসতিপূর্ণ নগর অঞ্চল যেমন ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুরে অল্প সময়ের অতিবৃষ্টিতেই দেখা দেয় জলাবদ্ধতা ও নগর বন্যা। অপরিকল্পিত নগরায়ণ, দখলকৃত খাল এবং দুর্বল ড্রেনেজ ব্যবস্থার কারণে পানি দ্রুত নিষ্কাশন সম্ভব হয় না, ফলে জনদুর্ভোগ চরমে পৌঁছে। এসব অঞ্চলে অতি বৃষ্টিজনিত বন্যা এখন একটি বার্ষিক সংকট হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অতি বৃষ্টি থেকে সৃষ্ট বন্যার ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বহুমাত্রিক ক্ষয়ক্ষতি ঘটে। কৃষিখাত সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়—ধান, পাট, সবজি ও মাছের খামার পানিতে তলিয়ে গিয়ে কৃষকের জীবন ও জীবিকায় গভীর সংকট তৈরি হয়। হাওর অঞ্চলে আগাম বন্যায় বোরো ধান কাটা শুরুর আগেই ডুবে যাওয়ার ফলে খাদ্য নিরাপত্তা হুমকিতে পড়ে। একইভাবে জলমগ্ন হয়ে পড়ে চাষের জমি, বীজতলা ও সবজি ক্ষেত, যা পরবর্তী মৌসুমেও প্রভাব ফেলে। মাছ চাষের পুকুর ভেসে যাওয়ায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক খামারিরা আর্থিকভাবে মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়ে।

এছাড়া, বন্যায় ঘরবাড়ি, সড়কপথ, ব্রিজ-কালভার্ট ও বাঁধ ধসে পড়ে বা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতি সরকারি ও ব্যক্তিগত খাতে বিপুল আর্থিক ক্ষতি ডেকে আনে। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্যার পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় স্কুলগুলোর শ্রেণিকক্ষ আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে, কারণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো পানিবন্দি হয়ে পড়ে এবং পানিবাহিত রোগ ছড়িয়ে পড়ে। একইভাবে, বন্যাকালে সড়ক ও নৌপথ বিপর্যস্ত হয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়, ফলে মানুষের দৈনন্দিন জীবন, ব্যবসা ও পণ্য পরিবহন কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বাংলাদেশ সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর। এই অধিদপ্তর আবহাওয়া অধিদপ্তর, পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় প্রশাসনের সমন্বয়ে বন্যার পূর্বাভাস ও তথ্য সরবরাহ করে থাকে। আগাম সতর্কবার্তা প্রেরণ, দুর্যোগপূর্ণ এলাকার চিহ্নিতকরণ ও আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা তাদের অন্যতম কাজ। এছাড়া স্কুল, কলেজ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে প্রস্তুত রাখা হয়। দুর্গতদের মাঝে শুকনো খাবার, বিশুদ্ধ পানি ও চিকিৎসাসেবা প্রদানেও সরকারিভাবে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

স্থানীয় প্রশাসনের পাশাপাশি দুর্যোগকালে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, পুলিশ এবং স্বেচ্ছাসেবীরা সম্মিলিতভাবে উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। দুর্গতদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া, বাঁধ মেরামত, খাদ্য বিতরণ, এবং জরুরি চিকিৎসাসেবা প্রদানে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অনেক সময় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো নৌকা, ওষুধ ও খাবার সরবরাহ করে জনগণের পাশে দাঁড়ায়। দুর্যোগকালীন ও পরবর্তী পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় এসব বাহিনীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে বড়ো ভূমিকা রাখে। তবে জনসচেতনতা ও স্থানীয় পর্যায়ের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এই ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করা জরুরি।

বাংলাদেশে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থায় প্রযুক্তির ব্যবহার ধীরে ধীরে উন্নত হচ্ছে। আবহাওয়া অধিদপ্তর ও বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র দেশের নদ-নদীর পানি পর্যবেক্ষণ, বৃষ্টিপাতের তথ্য বিশ্লেষণ এবং সম্ভাব্য বন্যা পরিস্থিতির পূর্বাভাস দিয়ে থাকে। এই তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে আধুনিক রাডার ও উপগ্রহচিত্র ব্যবহার করা হচ্ছে, যা ঘনবৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা পানির গতিপথ সম্পর্কে আগাম ধারণা দেয়। এ ধরনের প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রশাসনকে সময়মতো প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করে।তাছাড়া, ডিজিটাল ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে প্লাবন প্রবণ অঞ্চলগুলো চিহ্নিত করা হচ্ছে এবং মোবাইল অ্যাপ ও এসএমএসের মাধ্যমে জনগণকে পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা পাঠানো হচ্ছে। পাশাপাশি কিছু অ্যাপে পানি বৃদ্ধি ও প্লাবনের সম্ভাব্য সময় এবং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মানচিত্র প্রদর্শিত হচ্ছে।

বন্যাকালীন সময়ে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা রক্ষায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ করণীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। প্লাবিত এলাকার নলকূপের মুখ বেঁধে রাখা উচিত যাতে দূষিত পানি ঢুকে পানির উৎস অশুদ্ধ না হয়। একইসঙ্গে বিশুদ্ধ খাবার পানির জন্য পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট বিতরণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। শুকনো খাবার যেমন চিড়া, গুড়, বিস্কুট, লবণ ইত্যাদি সংগ্রহ ও বিতরণ করা জরুরি, বিশেষ করে শিশু ও গর্ভবতী নারীদের জন্য। গবাদি পশুর নিরাপদ আশ্রয় ও খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা না হলে গ্রামীণ জীবিকায় বড় ধাক্কা লাগে। বন্যার সময়ে ডায়রিয়া, টাইফয়েড, হেপাটাইটিস, স্ক্যাবিস ও চর্মরোগের প্রাদুর্ভাব বেড়ে যায়, তাই পর্যাপ্ত ওষুধ, স্যালাইন ও স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা রাখতে হবে। এই সব ব্যবস্থাই একটি দুর্যোগকালে মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকি কমিয়ে দেয় ও টিকে থাকার সক্ষমতা বাড়ায়।

বন্যা ও অতিবৃষ্টিজনিত দুর্যোগের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে স্থানীয় জনগণ নানা অভিযোজন কৌশল গ্রহণ করেছে। তারা নিজ উদ্যোগে বাঁধ নির্মাণ করছে এবং ঘরবাড়ি উঁচু ভিত্তির ওপর তৈরি করছে, যাতে বন্যার পানি উঠলেও বসবাসের জায়গা সুরক্ষিত থাকে। অনেক এলাকায় গ্রামভিত্তিক বন্যা প্রতিরোধী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যেমন: পানি নিষ্কাশনের ছোটো খাল কাটা, উঁচু আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি, ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন। এছাড়া, কৃষিক্ষেত্রে উদ্ভাবনী কৌশল হিসেবে ভাসমান কৃষি বা হাইড্রোপোনিক্স পদ্ধতি চালু হয়েছে, যেখানে পানির ওপর ভেলায় শাকসবজি চাষ করা হচ্ছে। এসব অভিযোজন কৌশল স্থানীয় জনগণকে বন্যার ক্ষতি থেকে বাঁচতে সহায়তা করছে এবং তাদের জীবিকায় স্থিতিশীলতা আনছে। পাশাপাশি, পরিকল্পিত নগরায়ণের মাধ্যমে জলাধার, খাল ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে, যাতে পানি নিষ্কাশনে কোনো বাধা না থাকে। দীর্ঘমেয়াদি পানি ব্যবস্থাপনা নীতির মাধ্যমে বর্ষা ও খরার সময়কার পানির ভারসাম্য রক্ষা করা যাবে। সর্বোপরি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় পর্যায়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে জনগণকে প্রশিক্ষিত ও প্রস্তুত করতে হবে, যাতে তারা দুর্যোগের সময় দ্রুত ও কার্যকরভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে।

#

লেখক: সহকারী তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

পিআইডি ফিচার